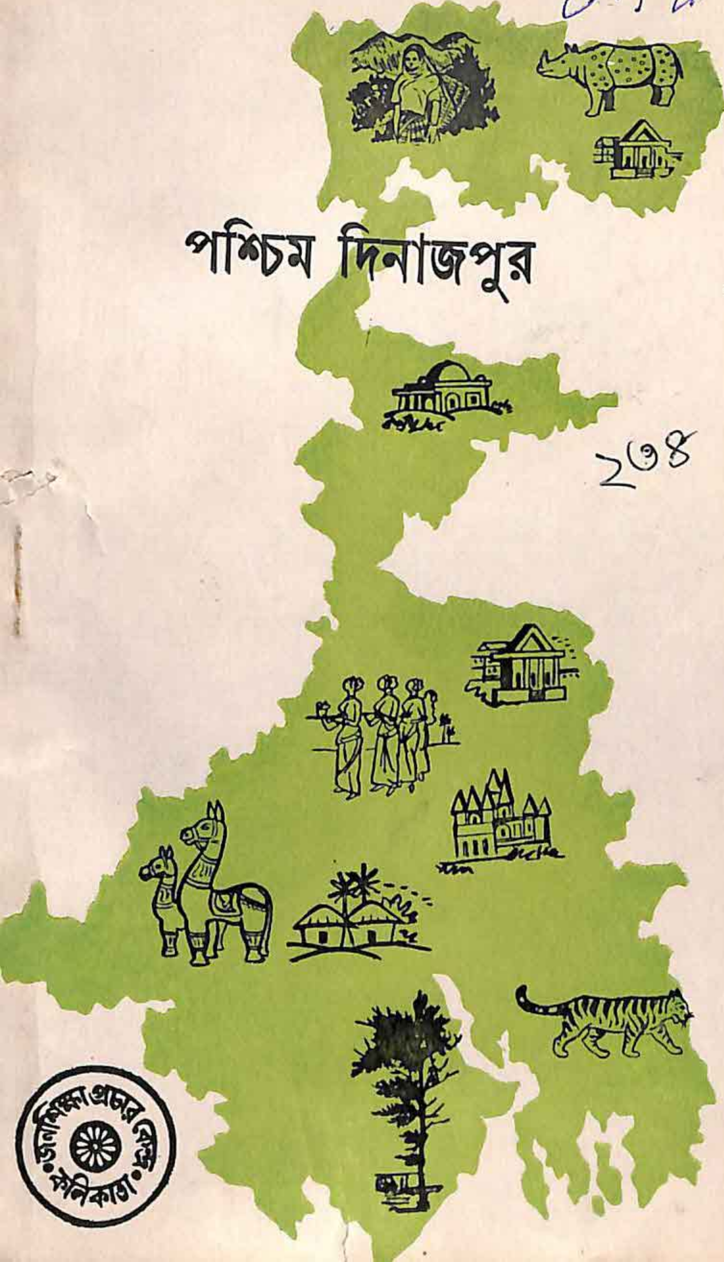
পশ্চিম দিনাজপুর



জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র • কলিকাতা •

পশ্চিম দিনাজপুর

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব, জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
প্রকাশন বিভাগ
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নূতন মুদ্রণ—১৯৮৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

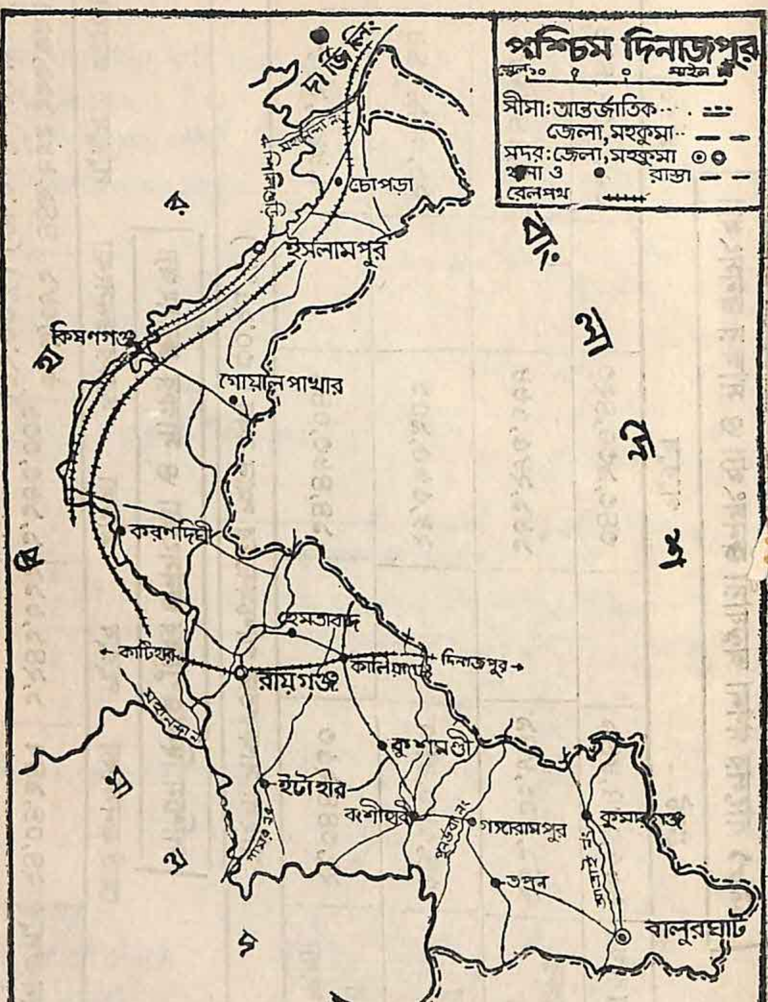
১৯৮১ সালের গণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ও সাক্ষর জনসংখ্যা

	মোট	পুরুষ	মহিলা
ভারতের জনসংখ্যা	৬৬৫,২৮৭,৮৪৯	৩৪৩,৯৩০,৪২৩	৩২১,৩৫৭,৪২৬
ভারতের সাক্ষর জনসংখ্যা	২৪১,০৩১,৮৪৯	১৬১,২৮৫,৫৬৮	৭৯,৭৪৬,২৮১
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা	৫৪,৫৮০,৬৪৭	২৮,৫৬০,৯০১	২৬,০১৯,৭৪৬
পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষর জনসংখ্যা	২২,৩৪৪,২৫৩	১৪,৪৬৩,০৪৫	৭,৮৮১,২০৮

মহিলা সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম (৩০·২৫%)

পশ্চিম দিনাজপুরের জনসংখ্যা ও সাক্ষর জনসংখ্যা

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	সাক্ষর জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
পশ্চিম দিনাজপুর	২৪,০৪,৯৪৭	১,২৪১,৬১১	১,১৬৩,৩৩৬	৬৪৯,৩৮১ (২৯·০০%)	৪৪৯,৬৮৯ (৩৬·২১%)	১৯৯,৬৯২ (১৯·৯৬%)


পশ্চিম দিনাজপুর
সীমা: আন্তর্জাতিক
জেলা, মহকুমা
সদর: জেলা, মহকুমা
রাস্তা
রেলপথ
চোপড়া
ইসলামপুর
কিষণগঞ্জ
গোয়ালপাখার
করণদিঘী
হেমতাবাদ
কাটিহার
রায়গঞ্জ
কালিয়াগঞ্জ
দিনাজপুর
কুশমণ্ডী
ইটাহার
বংশীহারী
গঙ্গারামপুর
তপন
কুমারগঞ্জ
বালুরঘাট
বাং লা দে শ

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

জেলার পরিচয়

ইংরাজী উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনরোই আগস্ট তারিখটা মনে করে রাখবার দিন। ঐ দিনই ভারত স্বাধীন হয়েছিল। ইংরেজরা এদেশের লোকের হাতে দেশের ভার ছেড়ে দিয়েছিল ঐ তারিখে। তার সঙ্গে ঘটেছিল আরও অনেক ঘটনা। দেশভাগও হয়েছিল তখন থেকে। ভাগাভাগির ফলে বাংলার পূব্‌দিকের অংশ আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কতকগুলো জেলা পুরোপুরি বার হয়ে গেল। আর কতকগুলো জেলার কিছু অংশ বেরিয়ে গেল। বাংলার যে ভাগটা এদিকে থাকল তা হল পশ্চিম বাংলা। যা ওদিকে গেল তা হয়েছিল 'পূব্‌-পাকিস্তান'। এখন সেটা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে হয়েছে 'বাংলাদেশ'।

দিনাজপুর নাম কি করে হল

অনুমান করা হয় 'দিনাজ' কথাটা হয়েছে 'দনুজ' থেকে। ইতিহাসে দনুজ রায় নামে এক রাজার নাম

পাওয়া যায়। তিনি সোনার গাঁওয়ের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্য এই জেলা থেকে অনেক দূরে ছিল। কাজেই ঐ দনুজ রায়ের নামে এ জেলার নাম নাও হতে পারে। পাঁচশ বছরেরও আগে রাজা গণেশ গৌড় রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। উত্তর বাংলা তাঁর রাজ্যের ভিতর ছিল। তিনি নাম দিয়েছিলেন 'দনুজ মর্দন দেব'। তাঁর ঐ নামেই হয়তো দনুজপুর বা দিনাজপুরের নাম হয়ে থাকবে।

চারিদিকের সীমা

এই জেলার উত্তর দিকে মহানন্দা নদী এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলা। পশ্চিম দিকে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা এবং মালদা জেলা। দক্ষিণে মালদা জেলা এবং বাংলাদেশের রাজশাহী ও বগুড়া জেলা। পূব্ দিকে বাংলাদেশের দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা।

জলবায়ু

এই জেলা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। তাই দক্ষিণের থেকে উত্তরের জলবায়ু কিছুটা আলাদা। সবচেয়ে উত্তরের অংশ হিমালয়ের অনেকটা কাছে। কাজেই

ঐ অংশ বেশী শীতল। দক্ষিণে গরম একটু বেশী। ছয়টি ঋতুই এখানে আছে। সারা বছরের মধ্যে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বেশী বৃষ্টি হয়। চৈত্র-বৈশাখে কালবৈশাখীর ঝড়ও হয়। শীতকালে ভালই ঠাণ্ডা পড়ে। তবে তা অসহ্য নয়।

গাছপালা ও জীবজন্তু

নানারকমের ফলের গাছ এই জেলায় দেখা যায়। সেগুলি হল আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কলা। অন্য গাছের মধ্যে বট, নিম, কৃষ্ণচূড়া, বাবলা গাছ বেশী। পুকুরের ধারে ধারে তালগাছ আছে। বাঁশবাগান জেলার অনেক জায়গায় আছে। এখন অনেক নারকেল গাছ লাগান হয়েছে। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট বন আছে। সরকারী বনবিভাগও কিছু কিছু বন তৈরী করেছে। ঐ সব বনে শাল, সেগুন, হিজল, শিশু, শিমূল ও পলাশ গাছ দেখা যায়।

শিয়াল, খেঁকশিয়াল, নেউল এখানকার জন্তু। আগে বনের মধ্যে ছোটজাতের নেকড়ে বাঘ থাকত—এখন আর বড় একটা দেখা যায় না।

এখানে বিষধর সাপও অনেক আছে। তার মধ্যে চন্দ্রবোড়া ও কেউটেই বেশী। কোথাও কোথাও গোসাপ দেখতে পাওয়া যায়। নদী ও বড় পুকুরে আগে কুমীরও থাকত। এখন আর বড় একটা কুমীর দেখা যায় না।

এই জেলার পুকুর, বিল ও নদীতে অনেক রকমের মাছ পাওয়া যায়। যে সব মাছ পাওয়া যায় তাদের নাম হল কাতলা, রুই, মৃগেল, বাটা, কালবাউস, বোয়াল, আইর, ট্যাংরা, পাঙ্গাস্, পাব্দা, বাচা, ফলুই, চিতল, শোল, শাল, চ্যাং, শিঙ্গি, মাগুর, কৈ, খোলসে, পুঁটি, সরলপুঁটি, তিৎপুঁটি, ডারকে, তেচোখো, বাঁশপাতি, মৌরলা, ইলিশ, চাপিলা, রায়খরা ইত্যাদি।

নদী

এই জেলার নদীর ধারা মোটামুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে চলেছে। এ থেকে বোঝা যায় এখানকার ভূভাগ উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু।

মহানন্দা—এই নদী দার্জিলিং জেলায় শুরু হয়েছে। সেখানে একে বলা হয়, মহানদী। দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে

হয়ে এসে এই নদী বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ঢুকেছে। তারপর আবার এই জেলার ইটাহারে এলে এই নদীর সঙ্গে নাগর নদী মিশেছে। তারপর এই নদী কিছুদূর মালদা জেলার সঙ্গে সীমানা ভাগ করে বয়ে গেছে। পরে মালদা জেলার ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

নাগর—বাংলাদেশের উত্তরাংশের কোন জায়গা থেকে এই নদী শুরু হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও করণদীঘি থানার সীমানা যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে মিশেছে সেখান দিয়ে এই নদী এ জেলার ভিতরে ঢুকেছে। রায়গঞ্জ ও করণদীঘির সীমানা বরাবর বয়ে এসে আবার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার সীমানা ভাগ করে বয়ে গেছে। পরে ইটাহার থানায় মহানন্দার সঙ্গে মিশে গেছে। নোনা, সান্‌ধার, কুলিক এই ছোট নদীগুলো নাগর নদীতে মিশেছে।

সুই—মহানন্দা নদীতে মিশে যাবার আগে নাগর নদী থেকে একটি শাখা বার হয়েছে। এই শাখা নদীর নাম সুই। প্রায় আঠার মাইল আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এই নদী মহানন্দায় মিশেছে।

গামারী—কালিয়াগঞ্জ থানার রাঁধনীপাড়া বিল থেকে গামারী নদী বেরিয়েছে। ষোল মাইল পথ বেয়ে এই নদী সুই নদীর সঙ্গে মিলে গেছে।

ছিরামতি—এই নদীর পোষাকী নাম 'শ্রীমতি'। কালিয়াগঞ্জ থানার জলা থেকে এই নদী বার হয়েছে। তারপর ইটাহার ও কুশমুণ্ডি থানার সীমানা ভাগ করে বয়ে গেছে। পরে ইটাহার ও বংশীহারী থানার সীমানা ভাগ করে মালদা জেলায় ঢুকে পড়েছে।

ট্যাঙন্—জলপাইগুড়ি জেলার যে অংশ বাংলাদেশে চলে গেছে সেখানকার পীরগঞ্জ ও বোচাগঞ্জের সীমানা দিয়ে এই জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার ভিতরে এই নদী এই জেলায় ঢুকেছে। পরে কুশমুণ্ডি ও বংশীহারী থানার ভিতর দিয়ে বয়ে এসে মালদা জেলার ভিতরে চলে গেছে।

পুনর্ভবা—এর আসল নাম অপুনর্ভবা। ধারণা করা হত, এই নদীতে ডুব দিলে আর জন্ম নিতে হয় না, তাই অপুনর্ভবা। লোক মুখে হয়ে গেছে 'পুনর্ভবা'। গঙ্গারামপুর থানার সীমানা দিয়ে এই নদী জেলার ভিতরে ঢুকেছে। পরে গঙ্গারামপুর ও তপন থানার ভিতর বয়ে গিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে।

আত্রাই—কুমারগঞ্জ থানার উত্তর দিক থেকে এই নদী এ জেলায় এসেছে। কুমারগঞ্জ ও বালুর ঘাট থানার ভিতর দিয়ে এই নদী বয়ে চলেছে। তারপর বাংলাদেশের ভিতরে পড়েছে। আগে এই নদী খুব জোড়াল ছিল। এখন জলধারা কমে গেছে।

ইছামতি—বাংলাদেশ থেকে এসে কুমারগঞ্জ থানার সীমানা ও পরে এই থানার ভিতর দিয়ে বয়ে এসেছে এই নদী। তারপর পতিরাম থেকে কিছু উত্তরে রাধানগরের কাছে আত্রাই নদীতে ইছামতি মিশে গেছে।

যমুনা— হিলি থানার পূর্ব সীমায় এই নদী উত্তর দিক থেকে এসে ঢুকেছে। হিলি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে এই নদী বাংলাদেশে ঢুকেছে।

পুকুর ও দীঘি

এই জেলায় অনেক পুকুর আছে। গ্রামের লোকেরা আগে এই সব পুকুরের জল পান করত। এখন নলকূপের চলন বেড়ে যাওয়াতে পুকুরের জল খাওয়া কমে গেছে। ঐসব পুকুরের জলে নাওয়া ধোয়া সব

কাজ চলে। এই সব পুকুরে মাছের চাষ হয়। পুকুরের জলে জমি সেচও হয়।

এই পুকুরগুলির কয়েকটি আকারে বেশ বড়। সেগুলিকে লোকে দীঘি বলে। মহীপাল দীঘি, কাল্‌দীঘি, ধল্‌দীঘি, প্রাণ-সাগর এবং তপনদীঘি নাম করার মত।

মহীপাল দীঘি—এই দীঘি কুশমুণ্ডি থানায়। মনে করা হয়, রাজা 'মহীপাল' এই দীঘি খুঁড়িয়েছিলেন। এই দীঘির পাড়ে পুরানো কালের ভেঙে পড়া মন্দিরের চিহ্ন আছে। এ থেকে ধারণা হয় এই দীঘি অনেককাল আগের।

কাল্‌দীঘি—গঙ্গারামপুর থানায় বালুরঘাটের রাস্তার পাশে কাল্‌দীঘি। লোকেরা বলে 'বান' রাজার দুই রাণী ছিল। কালোরাণী আর ধলোরাণী। এই দুই রাণীর নামে তিনি কাল্‌দীঘি আর ধল্‌দীঘি খুঁড়িয়েছিলেন।

ধল্‌দীঘি—কাল্‌দীঘির অল্প দূরেই ধলদীঘি। ধলদীঘির পাড়ে একটি মেলা বসে।

প্রাণ-সাগর—এই দীঘিও গঙ্গারামপুর থানায়। দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ এই দীঘি খুঁড়িয়েছিলেন। দু-শো বছরেরও আগে এই দীঘি কাটান হয়।

তপনদীঘি—তপন থানায় এই দীঘি। এই দীঘি সবচেয়ে বড়। বান রাজা নাকি তর্পণ করার জন্য এই দীঘি কাটিয়েছিলেন। তাই এই দীঘির নাম 'তপনদীঘি'। ইতিহাস থেকে হদিশ পাওয়া যায় যে পাল ও সেন রাজাদের সময়ে এই দীঘি খোঁড়ান হয়েছিল।

জমির রকম

সারা জেলার জমি মোটমাট সমতল। উত্তর থেকে দক্ষিণে বরাবর ঢালু। করণদীঘি, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কুশমুণ্ডি, কালিয়াচক ও ইটাহার থানার কতক অংশ গঙ্গা ও অন্য সব নদীর বয়ে আনা পলিমাটি দিয়ে গড়া। এসব জায়গার জমি কোথাও বেলে দোয়াঁশ, কোথাও দোয়াঁশ, আবার কোথাও পলি। উত্তরে ইসলামপুর মহকুমার জমি তিস্তা নদীর বয়ে আনা মাটিতে গড়া। বংশীহারী থানার কিছু অংশ, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট,

হিলি ও তপন থানার মাটি লালচে। এখানকার উঁচু অংশের জমি বেলে দোয়াঁশ। নীচু অংশের জমি শক্ত পলিমাটি। সেচের জলের সুবিধা থাকলে বেশীর ভাগ জমিতেই বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হতে পারে।

খাল, বিল, পুকুর, দীঘির জলে এখানকার অনেক জমি সেচ পায়। হালে পাম্প দিয়ে নলকূপের জল তুলে সেচের সুযোগ বাড়ান হচ্ছে। ঐ সব পাম্প যত বেশী সম্ভব বিদ্যুৎ দিয়ে চালাবার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।

চাষ আবাদ

ধান এই জেলার বড় ফসল। আউশ, আমন, বোরো তিনভাবেই এখানে চাষ করা হয়। উত্তর বাংলার জেলাগুলির মধ্যে এই জেলাতেই ধানের ফলন সবচেয়ে বেশী। ঐ ফসলের পরিমাণও এই জেলায় বেশী।

ইসলামপুর মহকুমায় পাটের চাষ খুব বেশী। জেলার অন্য সব অঞ্চলেও পাট চাষ হয়। এই জেলার

লোকেরা ধানের পরেই পাট বেশী পরিমাণে পায়। মেস্তা পাটও কিছু পরিমাণে হয়।

এছাড়া সরিষা, মাষকলাই, ছোলা ও আখের চাষ হয়। আলু, বেগুন, টমাটো, লাউ, কুমড়োর চাষও এখানকার চাষীরা করে। মাষকলাই ছাড়া মুগ, মসূর, খেঁশারী এবং লঙ্কা ও তামাক পাতার চাষ হয়। এখন গম চাষের দিকে চাষীদের ঝোঁক পড়েছে। বছরে বছরে গম চাষের পরিমাণ বাড়ছে।

চাষ আবাদের দিকে সব জায়গার মত এখানেও খুব নজর দেওয়া হয়েছে। 'বাড়ফসলী' নানাজাতের ধানচাষ বছরে বছরে বাড়ছে। একই জমিতে যাতে দু-তিনটি ফসল ফি-বছর হতে পারে সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। চাষীরা যাতে সবুজ-সার, জৈব-সার, পোকা মারার ওষুধ ব্যবহার করে তার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। চাষবাসের উন্নত ধরনের কৌশল চাষীদের শেখান হচ্ছে। চাষের মূলধনের যাতে অভাব না ঘটে তার জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেওয়া হচ্ছে। এতে সুদের হার বেশ কম। ধার শোধ করার নিয়মকানুনও সহজ। সেচের জন্য পাম্প-সেট এবং তাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বছর বছর বেড়ে চলছে। ফলে এই জেলায় ফসলের পরিমাণও বাড়ছে।

শিল্প ও কুটির-শিল্প

এই জেলায় বেশীর ভাগ লোকের জীবিকা চাষ। ধান এখানকার বড় ফসল। এই জেলায় সেজন্য অনেকগুলি ধানকল আছে। অল্পদিন আগে রামপুরে একটি আধুনিক জায়গায় ধানকল বসান হয়েছে। এছাড়া ছোট আকারের একশো ধানভানা কল আছে।

জেলার বেশ কিছুলোক তাঁতে কাপড় বোনার কাজ করে। রায়গঞ্জ থানাতেই বেশী তাঁত আছে। অন্য সব থানাতেও অল্প কিছু তাঁত চালু আছে।

এছাড়া সোনারূপোর গয়না তৈরী, বিড়ি তৈরী, মাটির হাঁড়ি, মালসা, গেলাস তৈরীর কাজও কিছু লোকে করে।

জেলার যেসব জায়গায় আখের চাষ হয় সেখানেই আখের গুড় তৈরী করা হয়। বাঁশ বেতের ঝুড়ি, ধামা, কুলো, মোড়া তৈরী করেও কিছু লোক দিন চালায়।

এই জেলার চোপরা থানায় চা-বাগান আছে। এর নাম দেবী-ঝোড়া চা-বাগান। এখানকার চা কলকাতার বাজারে নীলামে বেচে ফেলা হয়।

জেলার আয়তন, মহকুমা, থানা, ব্লক

এই জেলার আয়তন দু-হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশী। জেলার সদর শহর বালুরঘাট।

মহকুমা—তিনটি মহকুমা নিয়ে এই জেলা। সদর মহকুমা, রায়গঞ্জ মহাকুমা ও ইসলামপুর মহকুমা।

থানা—জেলায় মোট পনেরটি থানা আছে। সদর মহকুমা হিলি, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ গঙ্গারামপুর ও তপন থানা। রায়গঞ্জ মহকুমায় রায়গঞ্জ, হিমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, বংশীহারী ও কুশমুণ্ডি থানা। ইসলামপুর মহকুমায় চোপরা, ইসলামপুর করণদীঘি ও গোয়ালপুকুর থানা।

ব্লক—গোয়ালপুকুর থানা বাদে বাকী চোদ্দটি থানার এক একটিকে নিয়ে এক-একটি ব্লক, গোয়াল-পুকুর থানায় দুটি ব্লক। ব্লক দুটির নাম গোয়ালপুকুর—১ ও গোয়ালপুকুর—২। এই নিয়ে জেলায় মোট ষোলটি ব্লক।

অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা— ব্লকগুলিতে কয়েকটি করে অঞ্চল পঞ্চায়েত আছে। সারা জেলায় মোট অঞ্চল হল ১৪৪টি। আবার কয়েকটি গ্রামসভা নিয়ে এক একটি অঞ্চল। জেলায় আছে মোট ৯৯১টি গ্রামসভা।

লোকজন

১৯৭১ সালের লোকগণনায় জেলার মোট লোক দাঁড়িয়েছে আঠার লাখ ষাট হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে ন লাখ আটষট্টি হাজার পুরুষ আর আট লাখ বিরানব্বই হাজার মহিলা। দশ বছর আগের গণনায় লোক ছিল তের লাখ চব্বিশ হাজারের কাছাকাছি। এদের ভিতর পুরুষ ছিল ছ-হাজার কম সাতলাখ। নারী ছিল ছয় লাখ তিরিশ হাজার। দশ বছরে জেলার লোক বেড়েছে পাঁচলাখ ছত্রিশ হাজারের মত।

আর ১৯৮১ সালের লোকগণনায় জেলার মোট লোকসংখ্যা—২,৪০৪,৯৪৭ জন তার মধ্যে পুরুষ—১,২৪১,৬১১, মহিলা—১,১৬৩,৩৩৬ জন।

ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর বালুরঘাট ও হিলি এই ছয়টি এ জেলার শহর। এই শহরগুলিতে বাস করে কমবেশী নব্বই হাজার পুরুষ এবং আশী হাজার মহিলা।

স্বাধীন হবার সময় যখন দেশ ভাগ হয়ে যায় তখন বহু লোক চলে এসেছিল এই জেলায় আশপাশের জেলা থেকে। দিনাজপর জেলার যে অংশ বেরিয়ে গেল

সেখান থেকে ত বটেই। তাছাড়া বগুড়া, পাবনা এবং পূবদিকের আরও নানা জেলা থেকে লোকেরা এই জেলায় এসেছিল। তারপর থেকে তারা এই জেলারই বাসিন্দা হয়ে গেছে।

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন ধর্মের লোকেরাই এই জেলায় বাস করে। নানা তফসিল জাতি ও তফসিল উপজাতির লোকও এই জেলায় বাস করে। এদের কতক হিন্দু কতক খ্রীষ্টান। তফসিল জাতিদের ভিতর রাজবংশী, পোলিয়া ও কোচদের নাম করা যেতে পারে। এইসব লোকদের কথা আর একটু জানা দরকার। নীচে পৃথক পৃথক ভাবে এদের কথা বলা হল।

রাজবংশী—এ-জেলার পনেরটি থানার মধ্যে এগারটি থানাতে রাজবংশীরা ছড়িয়ে আছে। রাজবংশীরা এখন পৈতে নেয়। হিন্দু বলেই তাদের ধরা হয়। রাজবংশীরা বৈষ্ণব মত মেনে চলে। তাদের দেহের গড়ন বেশ চওড়া। তাদের চোয়ালের হাড় উঁচু, চোখ সরু ও টানা টানা এবং নাক চ্যাপটা। চাষ-আবাদের কাজে এরা খুব খাটিয়ে লোক।

পোলিয়া—পোলিয়াদের দেহের গড়নও রাজবংশীদের মতই। এরাও জেলার এগারটি থানায় বাস

করে। পোলিয়ারাও বেশ খাটতে পারে এবং চাষের কাজও এরা ভালরকমই জানে।

কোচ—এই জেলায় বেশী কোচ বাস করে না। কোচবিহার জেলাতেই সবচেয়ে বেশী কোচ বসবাস করে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণের এই জেলায় কিছু লোক এসে পড়েছে এবং বাস করছে। এরা নিজেদের হিন্দু বলে। কোচরা দেখতে রাজবংশীদের মত। এখানকার বেশীর ভাগ কোচ শিবপূজা করে।

তফসিল উপজাতি হল সাঁওতাল আর ওরাঁও। এদের বিষয়েও অনেক কিছু জানবার আছে।

সাঁওতাল—আগে এই জেলায় বহু অনাবাদী জমি পড়েছিল। ঐ সব জমির মাটি ভেঙে জমিকে চাষের উপযোগী করতে অনেক মজুরের দরকার হয়েছিল। ঐ কাজ করতেই সাঁওতালদের এখানে আনা হয়েছিল। সে কম করেও একশো বছর আগের কথা। এই সাঁওতালরা বিহার এবং পশ্চিম বাংলার কাঁসাই ও দামোদর নদীর পার থেকে এখানে এসেছিল। তারপর থেকে এরা এই জেলাতেই বসবাস করছে।

সাঁওতালদের সমাজ-জীবন আলাদা ধরনের। গাঁয়ে গাঁয়ে এদের একজন মোড়ল থাকে। ঐ মোড়লকে

এরা বলে মাঝি। সব গাঁয়ে নানা কাজে সকলের মেলামেশার জন্য একটি সাধারণ জায়গা থাকে। একে বলা হয় মাঝি-থান। এইখানে মাঝিদেব সভা বসে। এইখানে সব বাদ-বিবাদ এবং দোষের বিচার হয়। মাঝি সভা ডেকে বিবাদের সালিশ এবং দোষের বিচার করে দেয়। সেই বিচার সকলে মেনে নেয়।

সাঁওতালদের বাড়ীঘর মাটির তৈরী হলেও বেশ ঝকঝকে করে নিকানো। বাড়ীর আশ-পাশ তারা ছিমছাম রাখে। বাড়ীতে ছোট ফুলবাগান করে। গাঁদা ফুলের গাছই বাগানে বেশী থাকে। কাঠ টগরের গাছও সাঁওতালরা লাগায়। ফুল তারা খুব ভালবাসে। পাল-পরবে মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে সাজে।

এখানকার সাঁওতালরা তিনটি পর্ব পালন করে। পোষণা পরব, ফাগুয়া পরব, চৈৎ পরব। পোষণা পরবকে অন্য জায়গায় বাঁধনা পরবও বলে। খেতের ফসল ঘরে তোলার পরই পোষণা পরব হয়। ফাগুয়া পরব হল দোল উৎসবের মত। চৈৎ পরবও তাদের আনন্দের পরব। সব পরবেই মাদল আর বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে তারা নাচগান করে। ধেনো-মদ খেয়ে তারা খুব আনন্দ পায়।

কুকুর পোষা সাঁওতালদের একটি সখ। সব পরিবারেরই পোষা কুকুর থাকে। কুকুর তাদের শিকারের সাথী। বছরে একবার তারা দল বেঁধে শিকার করতে যায়। বাড়ীতে তারা দেশী মুরগীও পালন করে। মোরগ-লড়াই দেখতে এরা খুব পছন্দ করে।

ধীরে ধীরে এখন সাঁওতালদের জীবনধারা বদলে যাচ্ছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া শিখে আধুনিক জীবনধারা বুঝতে শিখেছে। নানা রকমের খেলাধূলা, নাচগান, নাটক-অভিনয় শিখছে। কিছু কিছু হাতের কাজও শিখতে শুরু করেছে।

ওরাঁও—এরা আগে ছিল বিহারের ছোটনাগপুরের লোক। সাঁওতালরা যখন এই জেলায় এসেছিল ওরাঁও তখন এসেছিল একই কাজে।

ওরাঁওদের সমাজেও পঞ্চায়েত প্রথা চালু আছে। তাদের গোষ্ঠীর লোকদের সকল গাঁয়ে গ্রাম-পঞ্চায়েত আছে। এদের বিশ্বাস "উপরে ভগবান, তার নীচে পাঁচ।" ভগবানের পরেই পঞ্চায়েত। তাই পঞ্চায়েতের বিচার এবং মতামতের দাম এদের কাছে খুব বেশী। পঞ্চায়েতের প্রধানকে বলা হয় 'মুখিয়া'।

ওরাঁওরা সাঁওতালদের তুলনায় চেহারায় বেঁটে। তবে শরীর বেশ মজবুত ও সবল। এরাও খুব খাটতে পারে। মেয়ে-পুরুষ সকলে মজুরের কাজ করে। ওরাঁওরা শূকর ও মুরগী পালন করে। ধেনো মদ খেতে এরা খুব ভালবাসে।

ভাষা

সারা জেলার লোকেরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। তবে গোয়ালপুকুর, চোপরা ও ইসলামপুর থানার কিছুলোক উর্দু ভাষায় কথা বলে। হিন্দি-ভাষায় কথা বলে এমন কিছু লোকও এই জেলায় আছে। সাঁওতালেরা সাঁওতালী ভাষায় এবং ওরাঁওরা কুরুখ্ বা ওরাঁও ভাষায় কথা বলে। তবে যাদের ভাষা উর্দু ও হিন্দি তাদের বেশীর ভাগই লোক বাংলাও বলতে পারে। এমনকি সাঁওতাল এবং ওরাঁওরা কাজচলা গোছের বাংলা কথা বলতে পারে।

কোচদের ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা মিশে কোন কোন অঞ্চলে বাংলা কথা বলার একটা আলাদা ধরন চালু হয়েছিল। তার নমুনা এই রকম ঃ

"একজন মানুষের দুই ছাওয়া ছিল। তায়দের মধ্যে ছোট ছাওয়া আপন বাপকে কহিল্—বাপ্! সম্পতের যে ভাগ হামি পাম্ তা হামাক্ দেন।......"

একজন লোকের দুই ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোট ছেলে তার বাবাকে বলে—বাবা! সম্পত্তির যে ভাগ আমি পাব তা আমাকে দেন।

এখনও কোথাও কোথাও কথা বলার এই ধরন চালু আছে। তবে ছেলে-মেয়েদের ভিতর লেখা-পড়া যত বাড়ছে ততই এর চলন কমে আসছে।

চালচলন

এখানকার লোকদের চালচলন ভাল। এরা সরল, ঝগড়া-ঝাঁটি করার ঝোঁক এদের নেই। বিপদে পড়লে এরা হতাশ হয় না। ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে মামলা করতে চায় না। গাঁয়ের বুদ্ধিমান লোককে এরা বলে "দেওয়ানী"। "দেওয়ানী"ই ঝগড়া বিবাদের সালিশ করে দেয়, গাঁয়ের সমাজে তাকেই আইনজানা মানুষ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে গ্রামে শিক্ষা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রেওয়াজ কমতে শুরু করেছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

এই জেলায় ১২,৪১,৬১১ জন পুরুষ মানুষের মধ্যে লেখা-পড়া জানে ৪৪৯,৬৮৯ জন। আর ১১,৬৩,৩৩৬ জন স্ত্রীলোকের ভিতর লেখা-পড়া জানে ১,৯৯,৬৯২ জন। এ থেকে বোঝা গেল যে পুরুষদের দশজনের ভিতর চারজন লেখাপড়া জানা আর মেয়েদের আটজনের ভিতর লেখা-পড়া জানা মাত্র দুই জন।

সারা জেলায় প্রাইমারী স্কুল প্রায় দুই হাজার। জেলায় কলেজ আছে ৫টি। জেলা শহর বালুরঘাটে একটি ছেলেদের কলেজ ও একটি মেয়েদের কলেজ। এছাড়া রায়গঞ্জে একটি, কালিয়াগঞ্জে একটি ও ইসলামপুরে একটি কলেজ আছে। এই শেষের তিনটি কলেজে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং এর জন্য জেলায় দুটি বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষালয় আছে। একটি তরঙ্গপুরে আর একটি হল কামারপাড়ায়। লেখা-পড়া না-জানা নারী-পুরুষদের লেখা-পড়া শেখানোর জন্য এই জেলায় প্রায় ১00টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

বড়রা লেখা-পড়া শিখে যদি বই-খাতা শিকেয় তুলে রাখে তবে তারা সব ভুলে যায়। বড়রা যাতে লেখা-পড়া শেখার পর আরও বেশী জানতে পারে

তার জন্যে লাইব্রেরী দরকার। সেখানে নানারকমের বই থাকে। সেখান থেকে সবাই আপন দরকার মত বই নিয়ে পড়তে পারে। সারা জেলার শহরে ও গাঁয়ে অনেক লাইব্রেরী ছড়িয়ে আছে। জেলায় সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী হল 'বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার'। সাধু বাংলায় লাইব্রেরীকে গ্রন্থাগার বলে। লাইব্রেরী হল ইংরাজী কথা। বাংলায় কথাটি এমন চালু হয়েছে যে ঐ কথাটাই সকলের বেশী জানা।

এই জেলার রায়গঞ্জে একটি নতুন মহকুমা গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে। আর সব শহরে ও গাঁয়ে সরকারী খরচে চলে এমন অনেক লাইব্রেরী আছে। এছাড়াও জেলায় কয়েকশ সাধারণ লাইব্রেরী আছে। এগুলির ভিতর অনেকগুলি সরকারী অনুদান পায়।

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা রাত্রিবেলায় উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়ে যাতে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করতে পারে তার সুযোগও ঐ জেলায় আছে। দিনের কাজকর্মের পর অবকাশ কালে সন্ধ্যায় সব ঐ বিদ্যালয়ে পড়ান হয়।

আনন্দ উৎসব

খেয়ে-পরে মানুষ বেঁচে থাকে ঠিক। তবে মনের খোরাক না হলেও চলে না। অবসর সময়ে আনন্দ

উৎসবের জন্য মন আনচান করে। সেই অবসর কারো কাটে বই পড়ে, কারো কাটে গান-বাজনা-অভিনয় করে, কেউ কেউ বা খেলাধূলো করে সময় কাটায়। এক এক জায়গায় এইভাবে আনন্দ উৎসবের রীতির রেওয়াজ গড়ে ওঠে। এই জেলায় যেগুলির চল বেশী সেগুলি হল—(১) হরিনাম গান, (২) বিষহরা গান, ও (৩) সত্যপীরের গান।

হরিনাম গান— এই গানের জন্য বহু গাঁয়ে দল আছে। দলে একজন মূল-গায়ক, কয়েকজন দোহার ও দুজন খোল-বাদক থাকে। অনেক সময় হারমনিয়ম ও বাঁশের বাঁশীও গানের সঙ্গে বাজান হয়। মূল-গায়ক গান ধরেন। দোহারেরা করতাল বা মন্দিরা বাজিয়ে মূল-গায়কের সুরে গায়। গাঁয়ের কালী, শিব ও অন্য দেবতার মন্দিরের আটচালায় এই হরিনাম গান হয়। বৈশাখ মাসে এই দল সন্ধ্যায় সারা গাঁ ঘুরে সকলকে নামগান শোনায়। মাসের শেষে গাঁয়ের সকল বাড়ী থেকে চাল-ডাল নিয়ে একটি ভোজের আয়োজন হয়। গাঁয়ের নানা উৎসবেও এই হরিনাম গান হয়।

বিষহরা গান—বিষ হরে নেয় বা কেড়ে নেয় যে দেবী সেই হল 'বিষহরা'। তার মানে বিষহরা হল

'দেবী মনসা', মনসা সাপের দেবী। তাই তার ঐ নাম। বিষহরা গান হল মনসাদেবীর গান। মনসাদেবী কেমন করে পূজা আদায় করল গানে সে সব কথা বলা হয়। চাঁদসদাগর মনসাকে দেবী বলে মানে না। তার ছেলে লখিন্দরের যখন বেহুলার সঙ্গে বিয়ে হল তখন তাদের জন্য লোহার বাসরঘর তৈরী করা হল, তবু রক্ষা হল না। খুব ছোট ছেঁদা দিয়ে সাপ তার শরীরকে সুতোর মত সরু করে লোহার বাসর-ঘরে ঢুকে পড়ল। সাপের কামড়ে লখিন্দর মারা পড়ল। বেহুলা নাচ দেখিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে লখিন্দরকে বাঁচাল। আবার চাঁদ-সদাগরের সাতনৌকো ধন-দৌলত নদীতে ডুবে গেল। শেষে মনসার সঙ্গে রফা হল। বাঁ হাতে মনসাকে পূজা করতে রাজী হল চাঁদ-সদাগর। তখন সব ধন-দৌলত সে ফিরে পেল।

মানীলোকেরা যা করে সাধারণ লোকেরা দেখাদেখি তাই করতে থাকে। চাঁদ-সদাগর ধনীলোক, মানীলোক। তার দেখাদেখি সব লোকেই মনসার পূজো করতে লাগল। এইভাবে মনসাপূজা চালু হয়েছিল। বিষহরা গান এইসব ঘটনার কথা গানের সুরে সকলকে শোনান হয়। এই গানও দলবেঁধে করে। মূল গায়েনের হাতে একটি চামর থাকে। তার মাথায়

থাকে টুপি। সব ধর্মের মানুষেরাই এই গান শুনতে ভালবাসে।

সত্যপীরের গান—সত্যের দেবতা—হিন্দুরা বলে 'সত্যনারায়ণ', মুসলমানেরা বলে 'সত্যপীর'। সেই দেবতাকে পূজা করলে মনের বাসনা পূরণ হয়। হিন্দুরাও সত্যপীরের গান গায়, মুসলমানেরাও সত্যপীরের গান গায়। মূল গায়েন গলায় বড় পাথরের মালা পরে। কাল টুপি মাথায় পরে আর হাতে নেয় চামর। সত্যপীরের সাধনা করলে যে সব ফললাভ হয় তা গান গেয়ে শোনান হয়। এই গানও সব ধর্মের লোকেরা শোনে।

মেলা

এই জেলায় কোন কোন উৎসবে মেলা বসে। কয়েকটা বড় মেলার কথা এখানে বলা হল। অনেক পুরোনো দিন থেকে এইসব মেলা চলে আসছে।

বারুণী মেলা— বানগড়ের কাছে পুনর্ভবা নদীর তীরে অনেক কালের পুরোনো শিব আছে। ঐ শিবের

মন্দির ঘিরে বারুণী মেলা হয়। চৈত্র মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই মেলা হয়। মন্দিরের কাছে দুটি পুকুর আছে। একটির নাম 'অমৃতকুণ্ড', আর একটি জীবৎ কুণ্ড'। লোকেরা আগে আমৃৎ-কুণ্ডে ও পরে জীবৎ কুণ্ডে ডুব দেয়। তারপর শিবের পূজো দেয়।

ধল্‌দীঘির মেলা—গঙ্গারামপুর থানায় রামচন্দ্রপুরের কাছে আছে ধল্‌দীঘি। ধলদীঘির দক্ষিণ দিকের মাঠে মেলা বসে। এক মুসলমান ফকির নাকি এই মেলা চালু করেছিলেন। শীতের সময় এই মেলা বসে এবং দেড়মাস ধরে এই মেলা চলতে থাকে। এই মেলায় বহুলোক জমে। এখানে অন্য নানা জিনিসের সঙ্গে পশু-পাখীও কেনা-বেচা হয়।

করণদীঘির মেলা—করণদীঘি থানায় একটি বড় পুকুর বা দীঘির নামও 'করণদীঘি'। বৈশাখ মাসে ঐ দীঘির পাড়ে একটি মেলা বসে। লোকেরা মনে করে ঐ সময়ে ঐ দীঘিতে ডুব দিলে মনের বাসনা পূরণ হয়। তাই লোকেরা বাসনা-পূরণের মনোভাব নিয়ে মেলায় আসে।

অতীত কাল

যে এলাকা নিয়ে এখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা তা খুবই পুরোনো। বহু আগের বই পুঁথিতে এখানকার কথা আছে মহাভারত, পুরাণ এখানকার কথা বলেছে। অনেক আগে 'পুণ্ড্রবর্ধন' নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের ভিতরেই ছিল এ-জেলার এলাকা। 'পুণ্ড্র' নামে একজাতের লোক এখানে বাস করত। সেইজন্য রাজ্যের ঐ নাম হয়েছিল। পুণ্ড্রা ক্ষত্রিয়। মহাভারতের কর্ণ এদের সঙ্গে লড়াই করে এই রাজ্য জয় করেছিলেন। রামায়ণে আছে সীতাকে রাবণ রাজা চুরি করে নিয়ে যায়। রাম তখন সীতার খোঁজ করতে চারিদিকে লোক পাঠান। পূব্‌ দিকে যাঁরা সীতার খোঁজে গিয়েছিল তারা পুণ্ড্রদের দেশেও গিয়েছিল।

পুরোনো পুঁথিতে 'কোটিবর্ষের' কথা আছে। এও একটা পুরোনো মানুষদলের নাম। তারা থাকত 'দেবকোটে'। এখনকার বানগড়ই হল দেবকোট। গঙ্গারামপুর থেকে অল্প উত্তরে বানগড়। বলীরাজার ছেলে ছিলেন বানরাজা। তিনিই নাকি এই গড় তৈরী করিয়েছিলেন। বলীরাজা খুব শিবভক্ত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলীর ছেলে বানরাজার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। লড়াইয়ে বানরাজা হেরে গেলেও শিবের দয়ায় রক্ষা পেয়ে যান।

আমাদের দেশে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। সে হল দেড়হাজার বছর আগের কথা। সে সময়ে এই রাজ্যের অবস্থা ভাল ছিল।

উত্তর বাংলার একভাগের নাম ছিল বরেন্দ্রভূম। সেও হাজার-বারশো বছর আগের কথা। পাল-রাজারা পূব-ভারতে তখন রাজত্ব চালাতেন। এই পুণ্ড্রবর্ধন পাল রাজ্যের ভিতরে ছিল। তারপর সেন রাজাদের দখলে এই রাজ্য এসেছিল। এই সময় বাংলাদেশকে বলা হত গৌড়দেশ। এই জেলা তখন গৌড়দেশের ভিতরে ছিল। সেনরাজাদের পরে গৌড়দেশ মুসলমান রাজাদের শাসনে চলে যায়।

দুশো বছরের কিছু আগে দেশে কোম্পানীর শাসন আসে। কোম্পানী বলতে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"। ঐ নাম এক ইংরাজ বণিকদলের। নিজ দেশ থেকে তারা এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। ব্যবসাতে যাতে অনেক বেশী লাভ করতে পারে তার জন্য তারা রাজ্য চালনার ব্যাপারে নাক গলাতে লাগল। প্রথমে রাজার কর্মচারীদের ভজিয়ে, পরে সরাসরি রাজার

তোষামোদ করে নানা সুবিধা আদায় করতে লাগল। আরও পরে যখন তারা বুঝল তারা বেশ জেঁকে বসতে পেরেছে, তখন রাজার কথা অমান্য করতে লাগল। শেষতক কিছুদিন রাজার অসৎ কর্মচারীদের হাত করে বাংলার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করল। মুর্শিদাবাদ তখন বাংলার রাজধানী। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সঙ্গে পলাশীর মাঠে হল যুদ্ধ। ইংরাজদের সেনাপতি ছিল 'ক্লাইভ'। কিছু ঘুষখোর আমলার বেইমানীর ফলে বাংলার নবাব হেরে গেলেন। ঐ কোম্পানীই তখন হল বাংলার মালিক। আর ভারতেও তখন থেকে ইংরেজ রাজত্ব শুরু। সেই কোম্পানীর আমলে ব্রজমোহন মিত্র ছিলেন এ অঞ্চলের খাজনা আদায় করার মালিক।

আগেই বলা হয়েছে দিনাজপুর জেলা ভাগ হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আগের দিনের কথা দিনাজপুর জেলারই কথা। দিনাজপুর জেলার এক নামকরা জমিদার বংশের কথা জানা যায়। সেকথা বলতে গেলে এখন থেকে প্রায় পোনে চারশো বছর আগের কথা মনে করতে হয়।

‘আকবর’ তখন ভারতের রাজা। তাঁর ছেলে ‘সেলিম’ বাংলাদেশ শাসন করতেন। সেই সময়ে দিনাজপুরে এক গোঁসাই ছিলেন। তিনি দিনাজপুর ও মালদহ জেলার বেশ বড় অংশের জমিদার হয়েছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। শ্রীমন্ত দত্ত-চৌধুরী নামে তাঁর এক শিষ্য ছিল। গোসাঁইজী এই শিষ্যকে তাঁর জমিদারী দিয়ে যান। শ্রীমন্তর এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলে অল্প বয়সে মারা যায়। তাই মেয়ের ছেলে শুকদেব মাতামহের জমিদারী পান। দিল্লীর বাদশা’র কাছ থেকে তিনি রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। তখন থেকে এই বংশ ‘রাজবংশ’ বলে চলে এসেছিল। শুকদেব একটি দীঘি খুঁড়িয়েছিলেন। ঐ দীঘির নাম ‘শুকসাগর’। শুকদেবের তিন ছেলে। বড় দুজন বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। ছোট প্রাণনাথ চল্লিশ বছর জমিদারী চালিয়েছিলেন। তিনি জমিদারী এলাকাও অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন। তাঁর সময়েও একটি দীঘি খোঁড়ান হয় দিনাজপুর শহরের বিশ মাইল

দক্ষিণে বড় রাস্তার ধারে। এই দীঘির নাম "প্রাণ সাগর"।

প্রাণনাথের ছেলে ছিল না। রামনাথ নামে একটি ছেলেকে তিনি পালন করেছিলেন। ঐ ছেলে জমিদারীর মালিক হন। রামনাথ নিজের জমিদারীর উপরে বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে 'পতিরাম', 'পাটনিতলা' ও 'গঙ্গারামপুর' এই তিনটি জমিদারীর ভার পেয়েছিলেন। দিনাজপুর শহরের চার মাইল দক্ষিণে একটি দীঘি আছে। এই দীঘির নাম 'রামসাগর', রামনাথের সময়ে এই দীঘি কাটান হয়।

রামনাথের পর তাঁর ছেলে বৈদ্যনাথ জমিদার হয়েছিলেন। বৈদ্যনাথের ছেলে ছিল না। তাঁর বিধবা রাণী সরস্বতী রাধানাথ নামে একটি ছেলেকে পালন করেছিলেন। তখন ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর আমল। তারা রাধানাথকে রাজা বলে মেনে নিয়েছিলেন। তবে রাধানাথের সময়ে খাজনার টাকা শোধ করার কড়াকড়ি নিয়ে ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ বাধে। কোম্পানী

তখন নানা জোর জুলুম শুরু করে দেয়। ফলে জমিদারীর ভাঙন ধরে।

রাধানাথ খুব অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর বিধবা রাণী গোবিন্দনাথকে পালন করেছিলেন। গোবিন্দনাথ জমিদারী চালাবার উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি আবার অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর পরে তাঁর ছেলে তারকনাথ জমিদারী পান। তাঁরও কোন ছেলে ছিল না। বিধবা রাণী শ্যামমোহিনী গিরিজানাথকে পালন করেন। গিরিজানাথের ছেলে জগদীশনাথ যখন রাজা তখনই দেশ ভাগ হয়। দিনাজপুর জেলা তাতে দু-ভাগ হয়ে যায়।

ইংরাজ আমলের শেষের দিকে এই জেলায় খুব গোলমাল হয়েছিল। এখানকার সাঁওতালরা গঙ্গারামপুর থানায় আন্দোলন করেছিল। পুলিসের সঙ্গে সাঁওতালদের বেশ বড় রকমের লড়াই হয়েছিল। কারণ সাঁওতালরা আইন অমান্য করে চলছিল। তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের নেতাদের আটক করে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

পুরোনো দিনের চিহ্ন

করণদীঘি— লোকেদের ধারণা এই যে, মহাভারতের কর্ণ এই দীঘি কাটিয়েছিলেন। তাই এর নাম 'করণদীঘি'। এখানে যে মেলা বসে তার কথা আগেই বলা হয়েছে।

করদহ—তপন থানায় পুনর্ভবা নদীর তীরে করদহ। দুশো বছর আগে দিনাজপুরের রাজারা এখানে একটি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। এখনও মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বান-রাজার লড়াইয়ের পর শ্রীকৃষ্ণ বানরাজার 'কর' বা হাত এখানে দাহন করেছিলেন। তা থেকেই এ জায়গার নাম করদহ'।

গঙ্গারামপুর—বখতিয়ার খলজীর এবং তার পরের মুসলমান সেনাপতিদের এখানে সেনা-শিবির ছিল। তখন এই জায়গার নাম ছিল দুম্‌দুমা। সেনাদের বাদ্য-

বাজনার আওয়াজ থেকে জায়গাটার ঐ রকম নাম হয়েছিল। এখন এটি একটি গঞ্জ হয়ে উঠেছে। এখানে একটি মন্দির আছে।

বানগড়— গঙ্গারামপুরের উত্তরে পুনর্ভবা নদীর পাশে বানগড়। এখানে বানরাজার রাজধানী ছিল বলে মনে করা হয়। বানরাজার মেয়ে ঊষা। শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ ঊষাকে হরণ করেছিল। এই নিয়ে বানরাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লড়াই বেধেছিল। বানরাজা লড়াইয়ে হেরে যান। বানরাজার নাকি একহাজার হাত ছিল। বানরাজাকে দুটি বাদে বাকী সব হাতগুলি এই লড়াইয়ে হারাতে হয়েছিল। বানরাজা শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবের বরে বানরাজা আবার সব হাত ফিরে পেয়েছিলেন। নদীর তীরে একটি শিব মন্দিরও আছে।

বানগড়ের মাটির ঢিবি খুঁড়ে অনেক পুরোনো কালের দালান, পাথরের তৈরী দেবদেবী পাওয়া গিয়েছে।

এগুলি ঠিক কোন্ সময়ের তা বলা কঠিন। কেউ কেউ বলেন পালরাজাদের সময়কার। কেউ বা বলেন আরও অনেক আগের যুগের।

বংশীহারী—বংশীহারী থানায় বংশীহারী। থানা থেকে আধ মাইল দক্ষিণে একটি ছোট মন্দির আছে। তার গড়ন খুবই পুরোনো দিনের। এর কাছাকাছি আরও অনেক দালান বাড়ী ও মন্দির ছিল। তার ভাঙাচোরা ভিতের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পুরোনো দিনে এখানে যে লোকবসতি ছিল এবং অনেক বাড়ীঘর ছিল তা অনুমান করা যায়।

বাজেবিন্দোল—রায়গঞ্জ থানায় বাজেবিন্দোল। এখানে একটি পুরোনো মন্দির আছে। এটি পাল-রাজাদের সময়ে তৈরী হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

ভিকাহার—তপন থানায় করদহ থেকে তিন মাইল দূরে এই জায়গা। অনেক আগের তৈরী মন্দিরের চিহ্ন এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

হেমতাবাদ—এখানে "মহেশ রাজার" রাজধানী ছিল। পরে মুসলমান সুলতানেরা এ জায়গা দখল করেছিলেন। সুলতান হুসেন শাহ্ এখানে তাঁর মেয়ের বিয়ের উৎসব করেছিলেন। সেই সময়কার দালান বাড়ীর ভেঙে-পড়া ভিতের চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বয়স্ক শিক্ষাঅধিকর্তা কর্তৃক সাক্ষোরোত্তর কর্মসূচীর জন্য নির্বাচিত

নিজের জেলাকে জানুন

- বর্ধমান
- পুরুলিয়া
- বাঁকুড়া
- কোচবিহার
- মালদহ
- বীরভূম
- পশ্চিম-দিনাজপুর
- হুগলী
- হাওড়া
- মুর্শিদাবাদ

সদ্য সাক্ষরদের জন্য "নিজের জেলাকে জানুন" সিরিজের দশটি জেলার বই প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী জেলার বইগুলি প্রকাশনার কাজ চলিতেছে।

সাক্ষরতার আসল কথা ঃ সক্ষমতা, সচেতনতা।
বাঁচার মত বাঁচতে চাও ঃ সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাও।
সাক্ষর নিরক্ষর ভাই ভাই ঃ গ্রাম গঠনে হাত লাগাই।
সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাই ঃ জীবন হল ধন্য ভাই।
নিরক্ষর কেন রও ঃ চেষ্টা কর সাক্ষর হও।
চোখ থাকতে অন্ধ কে ঃ নিরক্ষর থাকে সে।
নিরক্ষর থাকে যে ঃ বেঁচে যেন আধমরা সে।
নিরক্ষর কেউ রবে না ঃ আদর্শ গ্রাম তবেই না।